আগস্ট ২৫, ২০০৮, সোমবার : ভাদ্র ১০, ১৪১৫

নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন হয়নি

ফা র হা না রে জা

দেখতে দেখতে এক এক করে সাঁইত্রিশটি বছর পেরিয়ে গেল। প্রতি বছর স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নাম স্মরণ করি আমরা। একটি বিশেষ দিবস উদযাপনের অনুষঙ্গ হিসেবেই মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে স্মৃতিচারণই হয়ে ওঠে মুখ্য বিষয়। স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে আমরা যারা পত্রপত্রিকায় টিভি ক্যামেরায় নিজের চেহারা দেখানোর প্রতিযোগিতায় নামি তারা কি কখনও ভেবে দেখেছি– সাঁইত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস পূর্ণতা পায়নি! এ দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস রচিত হয়েছে। কিন্তু সে ইতিহাসে নারী মুক্তিযোদ্ধা ও এ দেশের নারী সমাজের অনবদ্য অবদানের কথা নেই। সরকারি উদ্যোগে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ১৬ খণ্ড গ্রন্থেও নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কোন তথ্য নেই। সেখানেও নারীর ভূমিকা চিত্রিত হয়েছে শুধু নির্যাতিতা হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীর ভূমিকা সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে সহযোগী হিসেবে– কোথাও তারা মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাইয়েছে, অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে, আশ্রয় দিয়েছে, তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছে– এর বেশি কিছু নয়। এ দেশের নারী মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতার ইতিহাসে যেমন উপেক্ষিত, রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ জীবনেও তাদের কেউ যথাযথ সম্মান দেয়নি। শুধু মুক্তিযুদ্ধই নয়, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপে ছিল নারীর সরব উপস্থিতি– সাহসী পদচারণা। অথচ ইতিহাসে নারীর সেই অবদানের স্বীকৃতি দিতে আমরা ক্ষমাহীন কার্পণ্য করেছি।

বলা হয়ে থাকে, মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের ৩০ লাখ মানুষের গণহত্যার শিকার হয়, যার অন্তত ২০ শতাংশ নারী। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সরকারি নথিপত্রে এর কোন তথ্য প্রমাণ নেই। তৎকালীন সরকারের হিসাব মতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে দুই লাখ মা-বোন নির্যাতিত হয়েছেন। কিন্তু মাঠভিত্তিক গবেষণা চালাতে গিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের গবেষণা কর্মীদের মনে নিশ্চিত ধারণা জন্মেছে– মুক্তিযুদ্ধকালে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা যা এতদিন বলা হয়ে আসছে, আসলে তা এর চেয়েও অনেক বেশি। তবে এতদিন পর তথ্য-প্রমাণ দিয়ে হয়তো এসব প্রমাণ করার সুযোগ কম। তাছাড়া নির্যাতিতরা সামাজিক সম্মান ও নিরাপত্তার কারণেই চান না এতদিন পর এসব নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি হোক। এসব কারণেই অনেক নির্যাতিত নারী তাদের ওপর নির্যাতনের লোমহর্ষক কাহিনী গবেষণা কর্মীদের কাছে মুখে মুখে বললেও তা টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করতে বা লিপিবদ্ধ করতে দিতে চাননি। তাদের অনেকেই এক্ষেত্রে অনুযোগের সুরে একটা কথাই বলে থাকেন, ‘এতদিন পর্যন্ত যেহেতু আমাদের কোন মূল্যায়ন হয়নি– এখন আর এসব নিয়ে গবেষণা করে কি হবে’? তবে দারিদ্র্যের কষাঘাতে বিপর্যস্ত অনেক নির্যাতিত নারীই এখন আর নিজেদের লজ্জা-গানি ঢেকে রাখতে চান না, তাদের বক্তব্য– জীবনই যেখানে চলছে না সেখানে এত লজ্জা-শরম রেখে আর লাভ কি? মুখ বুজে থাকার জন্যই তাদের স্বীকৃতি মেলেনি– তারা রাষ্ট্রীয় কোন সাহায্য-সহযোগিতা পাননি। কেউ তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। এমন অভিমতও অনেকের।

একাত্তরে দেশের তৃণমূলের নারীরা যেমন পাক বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তেমনি শহরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের নারীদের ওপরও নির্যাতন কম হয়নি। গ্রামের ঘটনাগুলো প্রচার পেয়েছে বেশি আর শহরের ঘটনাগুলো সামাজিক অবস্থানগত কারণেই ধামাচাপা পড়ে গেছে। ইতিহাস বলে শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারাবিশ্বেই যুদ্ধে নারী ও শিশুরাই বেশি ভিক্টিমাইজ হয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের কতজন নারী নির্যাতিত হয়েছিল এর সঠিক তথ্য দেশের কোথাও নেই। আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হয়েছে– সেখানেও নারী মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত নারীদের কোন তথ্য-উপাত্ত নেই। শুধু কি নির্যাতিত নারীর পরিসংখ্যান? বাংলাদেশে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা হয়েছে কয়েকবার– কিন্তু নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কোন পূর্ণাঙ্গ তালিকা এ পর্যন্ত করা হয়নি। নারী মুক্তিযোদ্ধারা কতটা অবহেলিত তার প্রমাণ হচ্ছে– অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে খেতাবপ্রাপ্ত মাত্র দু’জন নারী মুক্তিযোদ্ধা। তাদের একজন (তারামন বিবি) তার খেতাব প্রাপ্তির কথা জেনেছেন প্রায় ৩০ বছর পর। অথচ স্বাধীনতা অর্জনে দেশের তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ ও আমাদের নারী সমাজেরও ছিল বিশাল অবদান।

যুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষ দেখেছে, শুনেছে। কিন্তু যুদ্ধকালে নারীদের ওপর যে নির্মম নির্যাতন হয়েছে তার ক্ষত নিয়ে এখনও অনেক নারী বেঁচে আছেন। তাদের কষ্ট বেদনার ভার কেউ নেয়নি। কেউ তাদের আশ্বাসে-বিশ্বাসে কাছে টেনে নেয়নি।

পেশাগত কারণেই আমি বিভিন্ন জেলার এমন বেশ ক’জন নির্যাতিত নারীর মুখোমুখি হয়ে সরাসরি তাদের মুখ থেকে

সেই ভয়াবহতার কথা শুনেছি। গাজীপুরের বীরাঙ্গনা মমতাজ– মুক্তিযুদ্ধ যার জীবনটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। যুদ্ধকালে গ্যাং রেপের শিকার মমতাজের যৌনিপথ আর পায়ুপথ এক হয়ে গেছে। সাঁইত্রিশ বছর ধরে পেটে পাইপ বসিয়ে তাকে প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ড সারতে হচ্ছে। স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে করাতে তার স্বামী সচ্ছল কৃষক থেকে এখন শুধু ভূমিহীনই নয়, ভিটেবাড়িও হারাতে হয়েছে তাকে। অথচ সুচিকিৎসা পেলে মমতাজ সুস্থ হয়ে উঠতে পারতেন। কেউ তার পাশে দাঁড়ায়নি। জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্- মমতাজ বলেন, মুক্তিযুদ্ধ আমার জীবন থেকে সব কেড়ে নিয়েছে। যুদ্ধে এত মানুষের মরণ হল– কিন্তু আমার মরণ হল না কেন? চৌদ্দগ্রামের মানিকের বউ যুবতী খঞ্জনীকে এলাকার মানুষের বাড়িঘর ও জীবন বাঁচাতে স্থানীয় মোড়লরা পাক বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল। স্বাধীনতাবিরোধী সেসব মোড়ল সমাজে আজও মাথা উঁচু করে বিচরণ করছে। অথচ যে নারী তার সর্বস্ব বিলিয়ে গোটা গ্রামের মানুষের জীবন রক্ষা করল– স্বাধীন দেশে সে গ্রামেই স্থান হয়নি খঞ্জনীর। সব হারিয়ে পাগলিনী খঞ্জনী এখন পাশের গ্রামে এক সচ্ছল পরিবারের গোয়াল ঘরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। মুক্তিযুদ্ধ তার সংসার, সম্মান, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব কেড়ে নিয়েছে। এখন কেউ তার পাশে নেই। বিপন্ন বিস্ময় নিয়ে নির্বাক খঞ্জনী এখনও বেঁচে আছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শেষ দেখতে! গৌরনদীর নূরজাহান ওরফে নুরীর বৃদ্ধ পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল পাক বাহিনী। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে যুবতী নূরী আত্মহননের হুমকি দিয়ে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের দলে যোগ দেন। ইনফরমার হিসেবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাক শিবিরের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। পাক বাহিনীর অনেক অপারেশনের খবর নূরী এনে দিতেন মুক্তিযোদ্ধাদের। ১৯৭১ সালের ৫ নভেম্বর ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের শিকারপুর পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন নূরী। পালানোর চেষ্টাকালে তার পায়ে গুলি লাগে। তারপর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্- নূরী গৌরনদী কলেজে পাক ক্যাম্পে বন্দি ছিলেন। গৌরনদী থেকে পাক বাহিনী পালিয়ে যাওয়ার পর নূরীসহ আরও চৌদ্দজন নারীকে পাক বাহিনীর ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করে মুক্তিযোদ্ধারা। ক্যাম্পে আটক অবস্থায় আহত নূরীর ওপর চলে সীমাহীন যৌন নির্যাতন। সেই নূরী স্বাধীন দেশে নিজ পরিবারে ঠাঁই না পেয়ে ঢাকার এক বস্-িতে এসে ওঠেন। বাসা বাড়িতে ঝিয়ের কাজ আর দাইয়ের কাজ করে জীবন কাটছে তার। কুষ্টিয়ার তিন বীরাঙ্গনা নারী– দুলজান নেসা, এলেজান নেসা ও মাসুদা খানমের কথা বলা যায়। ২০০৬ সালে নারীকণ্ঠ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা তাদের ঢাকায় এনে সংবর্ধনা দিয়েছিলাম। সংবর্ধনার জবাবে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে এই তিন নারী অভিন্ন কণ্ঠেই উচ্চারণ করেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধ আর দ্যাশ আমাদের অপমান, অবজ্ঞা আর গঞ্জনা ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি'। পেশাগত দায়িত্বের সুবাদেই এমন শতাধিক নারী মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনা নারীকে জানি– যারা অভাব-অনটনে বিপর্যস্-। স্বাধীন দেশ হয়েছে– নতুন পতাকা হয়েছে। কিন্তু এসব নারী মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনা নারীদের ভাগ্যে উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করেছে কয়েক বছর হল– সেখানেও নারী মুক্তিযোদ্ধা ও একাত্তরের নির্যাতিত নারীদের কোন তথ্য-উপাত্ত নেই। এই মন্ত্রণালয়ের হর্তাকর্তারা কি বলতে পারবেন– এদেশে কতজন নারী মুক্তিযোদ্ধা আছেন? তারা কোথায়– কেমন আছেন? জানি, এসবের উত্তর তারা দিতে পারবে না। এমন বিচিত্র আমাদের এই দেশ যেখানে যুদ্ধাপরাধীরা দাবড়ে বেড়ায়– আর মুক্তিযোদ্ধারা ভিক্ষা করে, রিকশা চালায়, দিনমজুরি করে সংসার চালায়– মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে বঙ্গভবনে এঁটো কুড়াতে হয়– খঞ্জনীদের নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামের গোয়াল ঘরে মাথা গুঁজতে হয়। একটি পৃথক মন্ত্রণালয় থাকার পরও এভাবে আর কতকাল এ দেশের মুক্তিযোদ্ধা, নারী মুক্তিযোদ্ধা ও বীর কন্যারা উপেক্ষিত থাকবে?

ফারহানা রেজা : মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ও নির্বাহী পরিচালক, নারীকণ্ঠ ফাউন্ডেশন

This page has been printed from the web site of Jugantor (www.jugantor.com).
URL: http://www.jugantor.com/web/content/2008/08/25/news0524.htm

Jugantor
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সালমা ইসলাম
প্রকাশক সালমা ইসলাম কর্তৃক ১২/৭, উত্তর কমলাপুর (ইডেন মসজিদ সংলগ্ন) ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং থেকে মুদ্রিত।
ফোন : পিএবিএক্স: ৮৮-০২-৭১০২৭০১-৫, ৭১০১৯৪০, ৭১০২০০৪ রিপোর্টিং: ৮৮-০২-৭১০১৯৬৬
বিজ্ঞাপন : ৮৮-০২-৭১০১৩৮১ সার্কুলেশন : ৮৮-০২-৭১০১৯১৮ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১০১৯১৭